ইউনিট
১৩

গবাদিপ্রাণির রোগ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

গবাদি প্রাণির দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা তন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যাবলির বিচ্যুতিকে রোগ বলে। গৃহপালিত প্রাণি বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফলে প্রতি বছর বহু গৃহপালিত প্রাণি মারা যায়। তাই গবাদি প্রাণি সম্পদ সংরক্ষন করতে হলে এদের রোগব্যাধি প্রতিরোধ করতে হবে। রোগ ব্যাধি প্রতিরোধে গবাদি প্রাণি চিকিৎসকদের ভূমিকা থাকলেও গবাদি প্রাণির মালিককে এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। সুস্থ গবাদি প্রাণির লক্ষনগুলো জানা থাকলে গবাদি প্রাণি অসুস্থ হলে সহজেই বুঝা যাবে। রোগের ইতিহাস, গবাদি প্রাণির বিভিন্ন লক্ষন দেখে অসুস্থ গবাদি প্রাণি চেনা যায়। গবাদি প্রাণির কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায় গবাদি প্রাণি সুস্থ না অসুস্থ। অসুস্থ গবাদি প্রাণির চিকিৎসার জন্য গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে একটি কথা প্রচলিত আছে "চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়"। অর্থাৎ রোগ হলে চিকিৎসা করা হবে সে আশায় না থেকে আগে থেকেই এমন কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে যেন রোগই না হয়। তাহলেই রোগ দমন সহজ হবে। গবাদি প্রাণির রোগব্যাধি সঠিক ভাবে দমন করতে পারলে এদেশে গবাদিপ্রাণির সংখ্যা ও উৎপাদন উভয় বৃদ্ধি পাবে। গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন ধরনের রোগ দমনে জাতীয়ভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পালনকারিকে কিছু ব্যক্তিগত কার্যক্রমও গ্রহন করতে হবে। এসব পদক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে গ্রহন ও সম্পাদন করতে পারলে গবাদিপ্রাণির রোগব্যাধি দমন সহজতর হবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গবাদি প্রাণি রোগের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বিস্তার, গৃহপালিত প্রাণির ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী এবং অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৩.১ : গবাদি প্রাণি রোগের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বিস্তার
পাঠ - ১৩.২ : গৃহপালিত প্রাণির ভাইরাসজনিত রোগ
পাঠ - ১৩.৩ : গৃহপালিত প্রাণির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
পাঠ - ১৩.৪ : গবাদি প্রাণির পরজীবী জনিত রোগ ও
পাঠ - ১৩.৫ : গবাদি প্রাণির অপুষ্টিজনিত রোগ
পাঠ - ১৩.৬ : ছাগলের রোগ ব্যবস্থাপনা

পাঠ-১৩.১ গবাদি প্রাণি রোগের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বিস্তার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদি প্রাণি রোগ কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- গবাদি প্রাণি রোগের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	গবাদি প্রাণির রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, ছত্রাকজনিত রোগ, পরজীবীজনিত রোগ।

সাধারণভাবে গবাদি প্রাণির রোগ বলতে স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমকেই বোঝায়। সুস্থ পশুর কতকগুলো বাহ্যিক লক্ষণ রয়েছে। এ লক্ষণগুলোর কোনো ব্যতিক্রম ঘটলেই বুঝা যাবে গবাদি প্রাণি অসুস্থ বা রোগে আক্রান্ত। অর্থাৎ পর্যাপ্ত পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বজায় রাখার পর দেহ স্বাভাবিক কার্যসম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে সে অবস্থাকে রোগ বলা হয়। বিভিন্ন কারণে গবাদি প্রাণি অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। গৃহপালিত প্রাণির রোগ প্রতিকারের প্রথম শর্ত এদের স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন। গবাদি প্রাণির ঘর স্যাঁতসেঁতে অপরিস্কার হলেই রোগ ব্যাধি হওয়ার সহায়ক হয়।

গবাদি প্রাণির রোগের শ্রেণীবিভাগ

গবাদি প্রাণির রোগকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) সংক্রামক রোগ

ক) ভাইরাসজনিত রোগ খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ গ) ছত্রাকজনিত রোগ ঘ) পরজীবীজনিত রোগ-

পরজীবীজনিত রোগকে আবার দুই বাগে ভাগ করা যায়:

১. অভ্যন্তরীণ পরজীবীজনিত রোগ

- কৃমিজনিত রোগ
- প্রোটোজোয়াজনিত রোগ

২. বহিঃ দেহের পরজীবীজনিত রোগ

২. অসংক্রামক রোগ

ক) সাধারণ রোগ খ) বিপাকীয় রোগ গ) অপুষ্টিজনিত রোগ

রোগের শ্রেণীবিভাগ নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

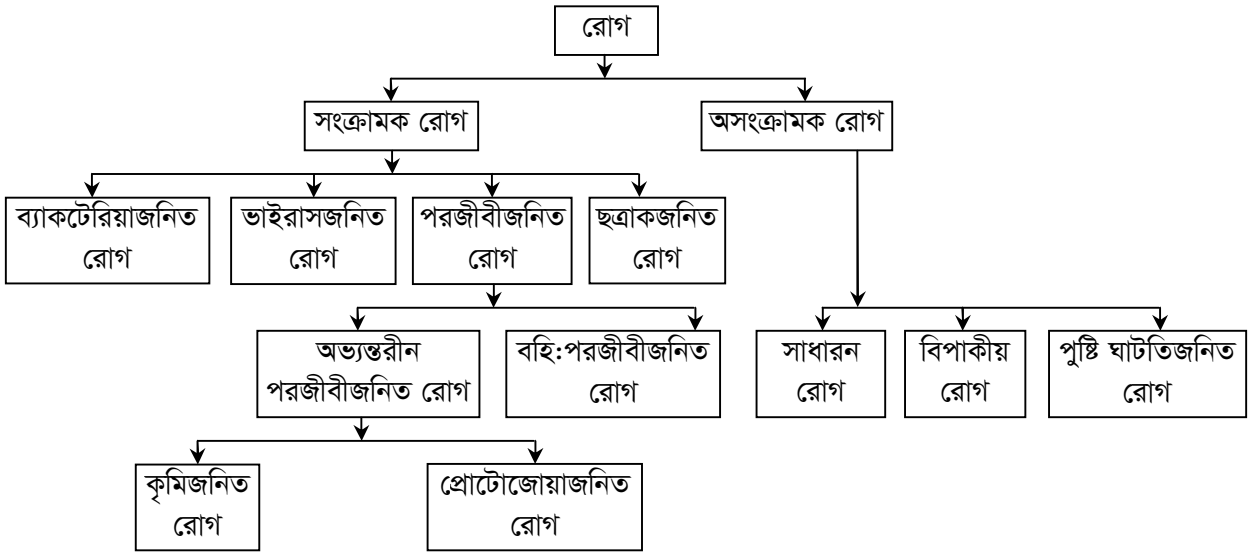

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে দলগত ভাবে গবাদি প্রাণি রোগের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

সুস্থ অবস্থায় গবাদি প্রাণির শরীরে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায়, যদি কোন কারনবশত ঐ সকল স্বাভাবিক লক্ষনের কোন পরিবর্তন ঘটে তবে তাকে আমরা রোগ বলি। গবাদি প্রাণির শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার যে কোন বিচ্যুতিই হল রোগ। মানুষের মতই গবাদি প্রাণি বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। গবাদি প্রাণির শরীরের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে সুস্থ ও অসুস্থ গবাদি প্রাণিকে চেনা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সংক্রামক রোগ কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

২। নিচের কোনটি সংক্রামক রোগ?
(ক) সাধারন রোগ (খ) পরজীবীজনিত রোগ
(গ) বিপাকীয় রোগ (ঘ) অপুষ্টিজনিত রোগ

৩। প্রোটোজোয়া জনিত রোগ কোন কারনে হয়?
(ক) ভাইরাসজনিত কারনে (খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত কারন
(গ) ছত্রাক জনিত কারনে (ঘ) অভ্যন্তরীন পরজীবীজনিত কারনে

পাঠ-১৩.২ গৃহপালিত প্রাণির ভাইরাসজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহপালিত প্রাণির ভাইরাসজনিত রোগ কি কি তা বলতে পারবেন।
- গবাদি প্রাণির বিভিন্ন ভাইরাস জনিত রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভাইরাস জনিত রোগ, ক্ষুরারোগ, গোবসন্ত, জলাতঙ্ক, পিপিআর

গৃহপালিত প্রাণির ভাইরাসজনিত রোগ

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গবাদি প্রাণিতে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি হয়ে থাকে। নিচে ভাইরাস জনিত কয়েকটি রোগের বিবরণ দেয়া হলো।

ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease)

ক্ষুরারোগ গবাদি প্রাণির একটি অত্যন্ত মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। দুই ক্ষুরবিশিষ্ট সকল প্রাণীই এ রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এ রোগের শিকার। এ রোগজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শ, খাদ্যদ্রব্য, লালা ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য এবং বাতাসের মাধ্যমে রোগজীবাণু সুস্থ প্রাণীতে সংক্রামিত হয়ে রোগের বিস্তার করে। এছাড়া মশা-মাছি কীটপতঙ্গ এ রোগের বাহক।

প্রচলিত নাম: বাতা, জ্বর, তাপা, খুরুয়া, ক্ষুরাচল, এসোঁ, ক্ষুরপাকা ইত্যাদি।
রোগের কারণ: ভাইরাস

রোগের লক্ষণ

১) প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা ১০৭° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
২) জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি, মুখের ভিতর এবং পায়ের ক্ষুরের মাঝখানে ফোস্কা ওঠে, পরে ফোস্ক ফেটে লাল ঘায়ের সৃষ্টি করে।
৩) মুখ দিয়ে লালা পড়ে। ঠোঁট নড়াচড়ার ফলে সাদা সাদা ফেনা বের হতে থাকে এবং চপচপ শব্দ করে।
৪) ক্ষুরের ফোস্কা ফেটে ঘা হয়, পা ফুলে যায় এবং গবাদি প্রাণি খুড়িঁয়ে হাঁটে।
৫) গাভীর ওলানে ফোস্কা হতে পারে, ফলে ওলান ফুলে ওঠে এবং দুধ কমে যায়।
৬) ছোট বাছুরের ক্ষেত্রে হৃৎপিন্ড আক্রান্ত হয় এবং কোন লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ মারা যায়।

চিকিৎসা

১) ক্ষুরারোগ দেখা দিলে আক্রন্ত গবাদি প্রাণিগুলোকে সুস্থ গবাদি প্রাণি হতে আলাদা করে পরিস্কার ও শুকনা জায়গায় রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই কাদা বা পানিতে রাখা যাবে না।
২) রোগ দেখা দেওয়ার আগে সমস্ত সুস্থ গবাদি প্রাণিকে ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে।
৩) আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে কচি ঘাস ও তরল খাবার যেমন ভাতের ফেন বা জাউভাত খেতে দিতে হবে।
৪) রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে স্থানীয় গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
৫) আক্রান্ত গবাদি প্রাণির মুখের এবং পায়ের ঘায়ের চিকিৎসা করতে হবে।
   - মুখের ক্ষত ও জিহ্বা প্রত্যহ ২/৩ বার পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (০.০১%) অথবা ফিটকারি বা এলাম (২%) দিয়ে ধুতে হবে।
   - ৩% আইওসান সলুশন দ্বারা ক্ষতস্থান দৈনিক ৩ বার করে ৩-৫ দিন ধুয়ে দিতে হবে।

- আইওসান দিয়ে ধোয়ার পর বোরো গ্লিসারিন (৪%) লাগানো ভাল। অথবা মুখের ঘায়ে সোহাগার খৈ গুড়া করে মধু বা ঝোলাগুড়ের সাথে মিশিয়ে লাগানো যেতে পারে।
  অথবা পায়ের ক্ষতস্থানে তুঁতে (১%) অথবা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (২%) অথবা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ০.০১% সলুশন দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। এর পর গন্ধকের গুড়া বা সলফানিলামাইড পাউডার দিনে ২-৩ বার লাগাতে হবে। নারকেল তেল ও তারপিন তেল ৪ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে ঘায়ে লাগালে ক্ষতস্থানে মাছি পড়বে না।

৬) ক্ষুরা রোগের জীবাণুর জটিলতা রোধে নিচের যে কোন একটি অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়।
   ১. ডিপোমাইসিন
   ২. অ্যালাবিপেন ১৫%
   ৩. এমিক্সিভেট ইনজেকশন
   ৪. জেন্টাসিন ৫% ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধ

- নিয়মিত সুস্থ গবাদি প্রাণিকে প্রতিষেধক টিকা প্রদানই রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তাই ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধের জন্য সুস্থ গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত রোগ প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। ক্ষুরা রোগের জন্য টিকা ছাগল ভেড়ার ক্ষেত্রে ৩ মাস এবং গরু-মহিষের ক্ষেত্রে ৬ মাস বয়স হতে প্রতি ৬ মাস অন্তর টিকা দিতে হবে।
- ট্রাইভ্যালেন্ট এফএমডি টিকা গরু মহিষের ক্ষেত্রে ৬ মি.লি. এবং ছাগল-ভেড়ার ক্ষেত্রে ৩ মি.লি. হারে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে।

সাবধানতা

- যে ব্যক্তি আক্রান্ত প্রাণীর সেবাযত্ন করবে তার ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, হাত পা এবং ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিস অবশ্যই জীবাণুনাশক ঔষধ যেমন আইওসান/আয়োডিন দ্রবণ (৪ চা চামচ/১ লিটার পানি) দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে কোন অবস্থাতেই কাদামাটি বা পানিতে রাখা যাবে না।

২. গোবসন্ত (Rinder Pest)

গোবসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরু ও মহিষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগ হলে আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে বাঁচানো যায় না। আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শ, খাদ্য, পানি, বাতাস বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রোগজীবাণু সুস্থ প্রাণীতে সংক্রামিত হয়ে রোগের সৃষ্টি করে।

প্রচলিত নামঃ গোমড়ক, গুটি শীতলা, গোমারী ও কলেরা ইত্যাদি।

রোগের কারণঃ ভাইরাস

রোগের লক্ষণঃ

১. প্রথমে জ্বর হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে (১০৫-১০৭ ডিগ্রি) ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
২. মুখে ও খাদ্যনালিতে ঘা হয়।
৩. পায়খানা প্রথমে শক্ত হয়, পরে পাতলা হয়।
৪. মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং গবাদি প্রাণির শ্বাসকষ্ট হয়।
৫. মুখ, নাক ও চোখ দিয়ে তরল ঝরে।
৬. দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়।
৭. অতিরিক্ত ডায়রিয়ায় পানিশুন্যতা দেখা যায়।
৮. গবাদি প্রাণির খাওয়া কমে যায়। দুর্বল ও অবশ হয় এবং মারা যায়।

চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ

১. এ রোগের কোন উপযুক্ত চিকিৎসা নেই। তবুও রোগের চিকিৎসায় গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

২. আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে এসট্রিনজেন্ট মিশ্রণ দিনে তিন বার খাওয়ানো যেতে পারে।
৩. সুস্থ গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
৪. স্বাস্থ্যসম্মত লালন পালন ব্যবস্থা রোগ দমনে সহায়ক।
৫. মুখের ঘায়ের জন্য পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশানো পানি দিয়ে ধুয়ে জেনসান ভায়লেট দ্রবণ লাগানো যেতে পারে।
৬. আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে পরিস্কার পানি ও তরল খাদ্য খাওয়াতে হবে।
৭. জীবাণুর সংক্রমণ রোধে নিচের যে কোন একটি এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।
    - ডিপোমাইসিন
    - জেন্টামাইসিন
    - এম্পিসিলিন ২০%
    - রেনামাইসিন ইত্যাদি

৩) জলাতঙ্ক (Rabies)

জলাতঙ্ক একটি ভাইরাসজনিত রোগ। কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, বেজী প্রভৃতি প্রাণী এ রোগের জীবাণু বহন করে ও সাধারণত বেশি আক্রান্ত হয়। স্তন্যপায়ী সব প্রাণীরই এ রোগ হয়। মানুষেরও এ রোগ হয়। সাধারণত রোগাক্রান্ত কুকুর বা বিড়ালের কামড়ে গৃহপালিত গবাদি প্রাণি ও মানুষের এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত প্রাণীর লালা সুস্থ প্রাণীর দেহের ক্ষতে লেগেও রোগজীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।
রোগের কারণ: ভাইরাস

রোগের লক্ষণ:

১. আক্রান্ত প্রাণী বা ক্ষ্যাপা বা উত্তেজিত অবস্থায় ঘোরাঘুরি করে এবং অন্য গবাদি প্রাণিকে আক্রমন করতে চেষ্টা করে।
২. গবাদি প্রাণির চোয়ালের অবশতা দেখা দেয়, ফলে গবাদি প্রাণি গিলতে পারে না।
৩. গলার মাংসপেশীতে পক্ষাঘাত হয়, ফলে চোয়াল নিচের দিকে ঝুলে পড়ে।
৪. প্রথমে দেহের পিছনের অংশ অবশ হয়ে যায় এবং দুর্বলতার কারণে গবাদি প্রাণি হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। লুটিয়ে পড়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গবাদি প্রাণি মারা যায়।
৫. মুখ দিয়ে ফেনাযুক্ত লালা ঝরে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করে।
৬. পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে।
৭. পানি পিপাসা হয়, তবে পানি পান করতে পারে না। পানিকে ভয় পায়
৮. গবাদি প্রাণি ভগ্ন কণ্ঠে ঘন ঘন ডাকতে থাকে।
৯. আক্রান্ত ষাঁড় অতিরিক্ত যৌনানুভুতির কারনে অন্য গবাদি প্রাণি বা কোনো কিছুর ওপর লাফিয়ে ওঠে।
১০. রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে অবশতার কারণে গবাদি প্রাণি হঠাৎ করে মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

চিকিৎসা

১. রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর চিকিৎসা করে কোনো ফল পাওয়া যায় না।
২. জলাতঙ্ক রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে দংশনের পরপরই ক্ষতস্থান ২০% কোমল সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেললে উপকার পাওয়া যায়। এরপর ক্ষত স্থান কার্বলিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া উত্তম।
৩. অ্যান্টি সিরাম কামড়ানোর ক্ষতে প্রয়োগ করল ভাইরাস নিউট্রোলাইজ হয়।
৪. দংশনের পর অনতিবিলম্বে প্রতিষেধক হিসেবে এ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। গরুর জন্য দৈনিক ৩০ মিলি করে ১৪ টি ইনজেকশন দিতে হবে। অথবা ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ

১. রোগ প্রতিরোধের জন্য রাস্তার সমস্ত বেওয়ারিশ কুকুর মেরে ফেলতে হবে।
২. পোষা সকল কুকুরকে বছরে একবার প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
৩. জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

৪) ছাগলের পিপিআর রোগ (Pests Des Petits Ruminants)

ছাগলের পিপিআর রোগ একটি ভাইরাসজনিত রোগ। প্রায় সব বয়সের ছাগল এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই রোগে মৃত্যুর হার খুবই বেশি (৯০%)। প্রতিবছর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যে হারে ছাগল মারা যায় তাতে অভ্যন্তরীন আমিষের ঘাটতি হয় এবং চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পিপিআর রোগটি ১৯৪০ সালে সর্বপ্রথম আফ্রিকার আইভরি কোস্টে সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে রোগটি আরব পেনিনসুলাা হয়ে ১৯৮৭ সালে ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৯২ সালে আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ রোগের ভয়াবহতার জন্য একে গোট প্লেগ নামেও অভিহিত করা হয়। মহামারি হলেও এই রোগে শতকরা ৯০-১০০ ভাগ প্রাণী আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ৫০-৮০% প্রাণী মারা যায়। ছাগল পালন একটি লাভজনক পেশা বিধায় অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এ রোগ প্রতিরোধ করা অপরিহার্য।

রোগের কারণ ও বিস্তার

ছাগলের পিপিআর রোগের কারণ এক প্রকার ভাইরাস। এ রোগটি প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। তাছাড়া আক্রান্ত গবাদি প্রাণির সংস্পর্শ দ্বারা এবং খাবার অথবা পানির মাধ্যমে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মূলত এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ।

রোগের কারণঃ ভাইরাস।

রোগের লক্ষণ

১. প্রথমে অল্প অল্প জ্বর হয়। চোখ ও নাক দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়।
২. রোগ তীব্র হলে প্রচন্ড জ্বর, ডায়রিয়া এবং পরবর্তীতে নিউমোনিয়া হয়। নাক ও চোখের পাতা শ্লেষ্মা দ্বারা বন্ধ থাকে।
৩. কণ্ঠনালী ও পরিপাক নালীতে প্রদাহ ও রক্তক্ষরণ ঘটে। আক্রান্ত ছাগলের অবসাদ ও ক্ষুধামন্দা হয়।
৪. মুখে ক্ষত হয় এবং মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরা শুরু করে।
৫. শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।
৬. তীব্র ডায়রিয়া দেখা দেয় এবং মৃত্যু ঘটে। রক্তমিশ্রিত পানির মত তরল পায়খানা হয়।
৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাময়িকভাবে সম্পূর্ন ভেঙ্গে পড়ে। গর্ভবতী ছাগলের গর্ভপাত হয় ।
৮. মৃত্যর পূর্বে ছাগল মাটিতে শুয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ

১. আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে জবাই করে পুড়িয়ে ফেলে অথবা গবাদি প্রাণির গতিবিধি নিয়ন্ত্রন করতে হবে।
২. সুস্থ গবাদি প্রাণিকে ১ বছর অন্তর টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। বাচ্চার ৩ মাস বয়স হলে তাদেরকে অবশ্যই টিকা দিতে হবে। পিপিআর টিকা ১০০ সিসি ডাইলুয়েন্টর সাথে টিকা গুলানোর পর প্রতি গবাদি প্রাণিকে ১ মিলি করে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে।

চিকিৎসা

ছাগল আক্রান্ত হওয়ার পর পিপিআর রোগের চিকিৎসার জন্য এ্যান্টিসিরাম এ্যান্টিবায়োটিক সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এন্টিসিরামের সঙ্গে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে পিপিআর রোগাক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা করা হয়। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো–

- পিপিআর সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে ধ্বংস করা এবং
- ভাইরাসজনিত আক্রমণের ফলে শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়ার কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমনকে মোকাবেলা করা।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগের অবস্থা	এ্যান্টিসিরাম	এ্যান্টিবায়োটিক
১) ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া	১০ মি.লি. পরপর তিন দিন	১ মি.লি. /১০ কেজি দৈহিক ওজন প্রথম ডোজ, ২ দিন পর ২য় ডোজ। ডায়রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ট্রিনাসিন (৫০০মি. গ্রাম) অ্যামেডিস (৪০০ মি. গ্রাম) এবং ইন্টোভেট ট্যাবলেট এক সাথে মিশিয়ে দিনে দুই বার খাওয়াতে হবে। এ ছাড়াও পরিমাণমত ওরাল স্যালাইন খেতে দিতে হবে।
২) নিউমোনিয়া	১০ মি.লি. পরপর তিন দিন	একই প্রকার ঔষধ ১ মি.লি./১০ কেজি দৈহিক ওজন প্রথম ডোজ, ২ দিন পর ২য় ডোজ।
৩) তীব্র জ্বর, চোখ ও নাক দিয়ে তরল নিঃসরণ	১০ মি.লি. পরপর তিন দিন	একই প্রকার ঔষধ ১ মি.লি./১০ কেজি দৈহিক ওজন প্রথম ডোজ ২ দিন পর ২য় ডোজ এবং ট্রিনাসিন (৫০০ মি. গ্রাম)
৪) রোগাক্রান্ত গবাদি প্রাণির সঙ্গে একই শেডে বসবাসরত গবাদি প্রাণি	১০ মি. লি. পরপর দুই দিন	একই প্রকার ঔষধ ১ মি.লি./১০ কেজি দৈহিক ওজন প্রথম ডোজ ২ দিন পর ২য় ডোজ এবং ট্রিনাসিন (৫০০ মি. গ্রাম)

রোগ দমনে কৃষকের করণীয়

পিপিআর একটি ছোঁয়াচে রোগ । এ রোগ ছাগল পালনের জন্য একটি বড় অন্তরায়। এ রোগ দমনে কৃষকের করণীয় বিষয়সমূহ হচ্ছে-

১. ছাগলের বাসস্থান পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
২. অসুস্থ ছাগলকে সুস্থ ছাগল থেকে আলাদা করে শুকনা জায়গায় রাখতে হবে।
৩. স্থানীয় গবাদি প্রাণি চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের ব্যবস্থামত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. সুস্থ ছাগলকে স্থানীয় গবাদি প্রাণি সম্পদ বিভাগের কর্মীদের মাধমে প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
৫. আক্রান্ত ছাগল মারা গেলে মাটিতে দুই হাত গভীর করে চুন/ডলোচুন ছিটিয়ে পুঁতে ফেলতে হবে।
৬. আক্রান্ত বা মৃত ছাগলের বর্জ্যও মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৭. আক্রান্ত ছাগল বিক্রয় ও চলাচল বন্ধ করেতে হবে।
৮. এ রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত ছাগলের টিকা দিতে হবে।
৯. রোগের চিকিৎসায় গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. ছাগলের বসন্ত (Goat Pox)

ছাগলের বসন্ত অতি উচ্চমাত্রার তীব্র সংক্রামক রোগ। সর্বপ্রথম ১৯৩৬ সালে ভারতে এ রোগ আবিষ্কৃত হয়। বাতাসের সাহায্যে জীবাণু সংক্রামিত হয়ে রোগের সৃষ্টি করে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্য, শুশ্রুষাকারীর মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়িয়ে রোগের সৃষ্টি করে থাকে।

রোগের কারণঃ ভাইরাস

রোগের লক্ষণ

১. দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৫-১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট)
২. দেহের পশমহীন স্থানে যেমন- চোখ, কান, নাক, পিছনের পায়ের ভিতরের দিক, মুখের প্রান্তভাগ ও পায়ুভাগে গুটি গুটি ফোড়া হয়।
৩. জ্বর হওয়ার ২-৫ দিনের মধ্যে ত্বকের ওপর সমস্ত দেহে গুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে গুটি গুলো লালচে গুটিতে পরিনত হয়।

৪. ওলান ও বাঁটে বসন্তের গুটি দেখা যায়।
৫. রোগের তীব্রতার সাথে সাথে পাতলা পায়খানা।
৬. তরল ক্ষরণ হতে হতে নাকে ঘা হয়।
৭. লিম্ফ নোড (Lymph node) ফুলে যায়।

চিকিৎসা

১. জীবাণুর সংক্রামণ রোধে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।
২. বসন্তের ক্ষতে ১% ক্লোরোমফেনিকল সলুশন ও টেট্রোসাইট্রিনের গুঁড়া দিনে একবার প্রয়োগ করলে ক্ষত সেরে ওঠে।
৩. রোগের প্রথম দিকে পক্স প্রতিরোধক ও এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যহার কমে।
৪. বেশি পাতলা পায়খানা হলে ভাতের মাড় খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ

১. ছাগলের প্রধান শত্রু ঠান্ডা, বিশেষ করে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে হবে।
২. ছয় মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সের ছাগল/ভেড়াকে এক বছর অন্তর গোট পক্স দিতে হবে। এ টিকা ৫০ সিসি ডাইল্যুয়েন্টের সাথে টিকা গুলানোর পর প্রতি গবাদি প্রাণিকে ১ মিলি করে চামড়ার নিচে দিতে হবে।
৩. স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থায় লালন-পালন করতে হবে।
৪. সুস্থ ছাগলকে রোগাক্রান্ত ছাগল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
৫. পরিস্কার বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে।
৬. বাসি পচা খাবার পরিহার করতে হবে।
৭. রোগ দেখা দিলে আশপাশের সকল সুস্থ ছাগলকে এন্টিপক্স সিরাম ইনজেকশন দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণীকক্ষে গবাদি প্রাণির বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের নাম, রোগের কারন, রোগের লক্ষন, চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গবাদি প্রাণিতে যেসব রোগ হয় তাদেরকে ভাইরাস জনিত রোগ বলে। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গবাদি প্রাণিতে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি হয়ে থাকে। ক্ষুরারোগ, গোবসন্ত, জলাতঙ্ক, পিপিআর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাইরাসজনিত রোগ। এসব রোগে গবাদি প্রাণির মৃত্যুর হার অনেক বেশি। তাই নিয়মিত সুস্থ গবাদি প্রাণিকে প্রতিষোধক টিকা প্রদানের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণিকে ভাইরাসজনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি ভাইরাস জনিত রোগ?
(ক) নিউমোনিয়া (খ) বাদলা রোগ
(গ) ক্ষুরারোগ (ঘ) তড়না রোগ

২। কোন রোগ হলে গবাদি প্রাণির চোয়ালের অবশতা দেখা দেয়?
(ক) জলাতংক (খ) গোবসন্ত
(গ) তড়কা রোগ (ঘ) ক্ষুরারোগ

৩। ছাগলের পিপি আর কি কারণে হয়।
(ক) ভাইরাসজনিত (খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত
(গ) ছত্রাকজনিত (ঘ) অপুষ্টিজনিত

পাঠ-১৩.৩ গৃহপালিত প্রাণির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহপালিত প্রাণির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ কি কি তা বলতে পারবেন।
- গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষন, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, নিউমোনিয়া, বাদলা, তড়কা, গলাফুলা, ওলান প্রদাহ

গৃহপালিত প্রাণির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

১) বাছুরের সাদা বাহ্য বা কাফস্কাওয়ার (Calfscour)

সাধারণত জন্মের সাথে সাথে বাছুর এ রোগে আক্রান্ত হয়। কৃত্রিম খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নাভি বা খাদ্যের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়ে রোগের সৃষ্টি করে। গাভীর প্রথম শালদুধ বা কলস্ট্রামের অভাবে, অনিয়মিত বা অধিক পরিমাণে দুধ বা আখাদ্য কু-খাদ্য খেলে এ রোগর সৃষ্টি হয়।

রোগের অন্য নামঃ ক্যালিবাসিলোসিস, বাছুরের সাদা উদরাময় রোগ।

রোগের কারণঃ ব্যাকটেরিয়া

রোগের লক্ষণ

১. শরীরের তাপমাত্রা প্রথমে বাড়ে, পড়ে স্বাভাবিক থেকে কমে যায়।
২. বাছুর চাল ধোয়া পানির মত সাদা রং এর পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল ত্যাগ করে।
৩. বাছুর ঘন ঘন মলত্যাগ করে। চোখ কোটের বসে যায় এবং পিঠ বাঁকা হয়ে যায়।
৪. নাভি ফুলে যায়, পেটে ব্যাথা হয়, হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়।
৫. বাছুরের অরুচি হয় ও শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।
৬. অনেক সময় মলে রক্ত দেখা যায় এবাং মলদ্বারের চারদিকে পাতলা মল লেগে থাকে।
৭. বাছুর খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং মারা যায়।
৮. বাছুর আস্তে আস্তে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা, জীবাণুমুক্ত জায়গায় বাছুর রাখতে হবে।
২. জন্মের সাথে সাথে বাছুরকে পরিমিত পারিমাণে মায়ের শালদুধ খাওয়াতে হবে।
৩. গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ওষুধ খাওয়াতে হবে।
৪. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।
৫. ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও সি খাওয়ানো যেতে পারে।
৬. শরীরে পানিশুন্যতা দেখা দিলে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

২) বাছুরের নিউমোনিয়া (Calf Pneumonia)

সাধারণত অল্প বয়সের বাছুরের নিউমোনিয়া হতে পারে। ঠান্ডা লেগে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফাংগাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমনে গবাদি প্রাণির নিউমোনিয়া হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণির শুকনা কাশি হয় এবং নাক দিয়ে সর্দি ঝরে।
২. গবাদি প্রাণি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।
৩. রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট হয়ে গবাদি প্রাণি মারা যায়।

৪. হৃৎপিন্ডের স্পন্দন ও শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
৫. বুকের মধ্যে গড় গড় শব্দ হয়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন বাছুরের শিরায় বা মাংসপেশিতে দিতে হবে।
২. গবাদি প্রাণির ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
৩. বাছুরের জন্য খড় দিয়ে বিছানা করে দিতে হবে যাতে ঠান্ডা না লাগে।

৩) বাদলা রোগ (Black quarter disease)

গরু-মহিষ, ছাগল, ভেড়া সাধারণত ৬ মাস থেকে দুই বছর বয়সে এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। শরীরের ক্ষতের মাধ্যমে এবং মলের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়ে রোগের সৃষ্টি করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষকলার মাধ্যমেও রোগজীবাণু সংক্রামিত হতে পারে।

প্রচলিত নাম: বাদলা পীড়া, জহরবাত, সুজওরা, কৃষজংগ রোগ ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ

১. শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৫°-১০৭° ফারেনহাইট)
২. **পেট** ফাঁপা দেখা যায় এবং গবাদি প্রাণি হঠাৎ খোঁড়াতে থাকে।
৩. পাছা এবং অন্যান্য জায়গায় মাংসপেশী ফুলে যায়
৪. ফোলা অংশের ভিতর পচন ধরে এবং চাপ দিলে পচ পচ শব্দ হয়।
৫. ফোলা জায়গায় চামড়া খসখসে কালচে এবং হাতে গরম অনুভূত হয়।
৬. আস্তে আস্তে ফোলা স্থান লালচে হয়ে যায়।
৭. আক্রান্ত জায়গা কাটলে বাতাস ও দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় লাল বা কালচে রঙের ফেনা বের হয়।
৮. গবাদি প্রাণির খাওয়া ও জাবর কাটা বন্ধ থাকে।

চিকিৎসা

১. নিচের যে কোনো একটি পেনসিলিন ইনজেকশন সম্পূর্ণ মাত্রায় অর্ধেক আক্রান্ত গবাদি প্রাণির চামড়ার নিচে ও বাকি অর্ধেক মাংসপেশীতে দিনে ২ বার করে ৫-৭ দিন ইনজেকশন দিতে হবে।
    - ডিপোসিলিন
    - প্রণাসিলিন
    - ডিউপ্লোসিলিন এল এ
২. পেনিসিলিনের পরিবর্তে টেরামাইসিন ১০ মি.লি. শিরা বা মাংসপেশীতে ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
৩. প্রয়োজনে আক্রান্ত ক্ষতস্থান অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে টিনচার আয়োডিন গজ প্রয়োগ করতে হবে। অথবা প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের গবাদি প্রাণির জন্য ৫ মি.লি. হিসাবে অক্সিসেনটিন ১০০ মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে। অথবা এন্টিহিস্টামিনিক গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ

১. অসুস্থ গবাদি প্রাণিকে সুস্থ গবাদি প্রাণি থেকে আলাদা করতে হবে।
২. মৃত গবাদি প্রাণির গোয়াল ঘর গরম ১০% NaOH দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।
৩. গর্ত করে ডলোচুন ছিটিয়ে মৃত গবাদি প্রাণিকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
৪. সুস্থ গবাদি প্রাণিকে ছয় মাস অন্তর প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

৪) তড়কা রোগ (Anthrax disease)

তড়কা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি গবাদি প্রাণি এ রোগে আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত গবাদি প্রাণির সংস্পর্শে জীবাণু সংক্রামিত হয়। বর্ষাকালে বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

প্রচলিত নাম: গলি, ধড়কা, তীরাজ্বর, উবামড়কী ইত্যাদি।

রোগের কারণ: ব্যাকটেরিয়া।

রোগের লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণি হঠাৎ লাফ দিয়ে মাটিতে ঢলে পড়ে, খিঁচুনি দেয় এবং মারা যায়।
২. শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৪°- ১০৬° ফারেনহাইট)
৩. শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়।
৪. অনেক সময় লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই গবাদি প্রাণি মারা যায়।
৫. মারা যাওয়ার পর রক্ত জমাট বাঁধে না।
৬. মৃত্যুর সাথে সাথে পেট ফুলে যায় এবং মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে।
৭. মৃত্যুর পর নাক, মুখ, কান ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত রক্তযুক্ত ফেনা বের হয়।

চিকিৎসা

১. মাংসপেশী বা শিরায় অক্সিসেনটিন ১০০ ইনজেকশন ২-৪ দিন পর্যন্ত দিতে হবে।
২. নিচের যে কোন একটি পেনিসিলিন ইনজেকশন দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়।

পেনিসিলিন ইনজেকশন	**প্রয়োগ মাত্রা**
০ ডিপোসিলিন/প্রনাসিলিন	প্রতিদিন ১০ মি. লি. দিনে ১-২ বার করে ৩-৫ দিন মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।
০ ডিইপ্লোসিলিন এ	প্রতিদিন ১০ মি. লি. করে ১ বার মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।
অথবা	
পেনিসিলিন + সেপ্টেমাইসিন	**প্রয়োগ মাত্রা**
০ ডিপোমাইসিন	প্রতিদিন ১০ মি.লি. করে ৩-৫ দিন মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।
০ ডাইওডেক্সামিন	প্রতিদিন ১০ মি.লি. করে ৩-৫ দিন মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।

অথবা, এন্টিহিস্টামিনিক গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিরোধ

১. আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে সুস্থ গবাদি প্রাণি থেকে আলাদা রাখতে হবে।
২. গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
৩. সুস্থ অবস্থায় গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত টিকা (তড়কা টিকা) প্রদান করতে হবে। এ টিকা ৪ বছর অন্তর গরু মহিষের ক্ষেত্রে ১ মিলি এবং ছাগলের ক্ষেত্রে ০.৫° মিলি হারে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে।
৪. মৃত গবাদি প্রাণিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা ২ মিটার গভীর গর্তে ডলোচুন ছিটিয়ে পুঁতে দিতে হবে।
৫. মৃত গবাদি প্রাণির গোয়ালঘর ১০% NaOH দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৫) গলাফুলা (Haemorrhagic septicemaia)

গলাফুলা একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। ছাগল ভেড়াতেও এ রোগ হতে পারে। রুগ্ন গবাদি প্রাণির লালা, সর্দি, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানি খাওয়ার ফলে এবং অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মাধ্যমে রোগজীবানু সুস্থ গবাদি প্রাণিতে সংক্রামিত হতে পারে।

প্রচলিত নাম: ব্যাংগা, ঘটু, গরঘটু, গলবেরা ইত্যাদি।

রোগের কারণ: ব্যাকটেরিয়া।

রোগের লক্ষণ

১. আক্রান্ত গবাদি প্রাণির ঘাড়, মাথা ও গলা ফুলে যায়। ফোলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
২. ফোলা অংশ শক্ত ও ব্যথাপূর্ণ থাকে। হাত দিয়ে গরম অনুভব হয় এবং টিপ দিলে বসে যায়।
৩. শরীরের তাপমাত্রা অত্যাধিক (১০৫-১০৭ ফারেনহাইট) বেড়ে যায়।
৪. ফোলা স্থানে সূচ দিয়ে ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ বের হয়।
৫. মুখ দিয়ে লালা ও নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
৬. শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় ঘড় গড় শব্দ করে।
৭. গবাদি প্রাণি জিহ্বা বের করে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করে।
৮. গলার নিচে চোয়াল, বুক, পেট ও কানের অংশে পানি জমে ও ফুলে যায়।
৯. গবাদি প্রাণি কিছু খেতে পারে না এবং জাবরকাটা বন্ধ করে দেয়।
১০. গবাদি প্রাণির দুধ দেয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং গবাদি প্রাণি মারা যায়।
১১. পেটে ব্যথা হয় এবং উদরাময় দেখা দেয়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. রোগাক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে গবাদি প্রাণি সুস্থ থেকে আলাদা রাখতে হবে।
২. সুস্থ গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা (গলা ফুলা টিকা) দিতে হবে।
৩. গবাদি প্রাণির বাসস্থানে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে।
৪. আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করতে হবে।
৫. উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।

৬) ওলান ফোলা বা ওলান প্রদাহ রোগ (Mastitis)

অধিক দুধ উৎপাদকারী গাভী ও ছাগীতে এ রোগ বেশি হয়। অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতস্যাঁতে বাসস্থান, ময়লা হাতে দুধ দোহন, বাঁটে বা ওলানে আঘাত, ওলানে দুধ জমাট বেঁধে থাকা প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়ে এ রোগ সৃষ্টি হয়।

প্রচলিত নামঃ ওলান পাকা, ঠুনকো, ওলান ফুলা ইত্যাদি।

রোগের কারণঃ বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, রিকেটশিয়া, মাইকোপ্লাজমা ইত্যাদি জীবাণু।

রোগের লক্ষণ

১. ওলান লাল হয়ে ফুলে যায় এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনভূত হয়।
২. বাট ও ওলান শক্ত ও গরম হয় এবং ওলানে ব্যথা হয় । ব্যথার জন্য গাভী ওলানে হাত দিতে দেয় না।
৩. দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
৪. দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হয়। দুধ দোহনের পর দুধে তলানি জমে।
৫. দুধের সাথে রক্তও বের হতে পারে।
৬. ওলান ও বাঁট নষ্ট হয়ে গাভীর দুধ বন্ধ হয়ে যায় এবং গাভী দুধ উৎপাদনে অকেজো হয়ে যায়।

চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ

১. গবাদি প্রাণিকে শুকনা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে।
২. ওলান সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
৩. দোহনের পূর্বে দোহনকারীর হাত ধুয়ে নিতে হবে।
৪. গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শমত চিকিৎসা নিতে হবে।
৫. ওলান গরম হলে বা ঠান্ডা হলে ঈষৎ গরম সেক দিতে হবে।
৬. দেহের তাপমাত্রা বেশি বেড়ে গেলে ঠান্ডা পানি দিয়ে গাভীর শরীর ধুয়ে দিতে হবে।
৭. শক্ত ওলানে দুই তিনবার কর্পূর তেল মালিশ করতে হবে।

৮. ওলানে জমে থাকা দুধ বের করে দিতে হবে। ঘন ঘন গাভীর দুধ দোহন করতে হবে।
৯. দুধ বের না হলে ২মিলি অক্সিটোসিন সিনথ মাংসপেশীতে প্রয়োগ করতে হবে।
১০. বাঁটের মুখ বন্ধ হলে টিট স্ক্রু অথবা টিটস্পুন দিয়ে বাঁটের মুখ পরিষ্কার করতে হবে।
১১. আক্রান্ত বাঁটের দুধ ফেলে দিয়ে নিচের যে কোনো একটি এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রতিদিন প্রতিটি আক্রান্ত বাঁটে ১টি করে ৩ দিন সরাসরি বাঁটের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
    - সুপারমাস্টিকোট
    - নিউমাস্ট
    - মাস্টিনেট
১২. গাভীর দেহে জ্বর থাকলে নিচের কোনো একটি এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন প্রতিদিন ১০ মিলি করে আক্রান্ত গবাদি প্রাণির মাংসপেশীতে ৩-৫ দিন ইনজেকশন দিতে হবে।
    - ডিপোমাইসিন ২০/২০ ইনজেকশন
    - বাইওডেক্সমিন ইনজেকশন
    - এম্পিসিলিন ২০% ইনজেকশন
    - জেন্টাসিন ৫%
    - অক্সিটেট্রাসাইক্লিন

৭) ন্যাভাল-ইল বা নাভি রোগ (Naval ill/joint ill)

জন্মের পরপরই বাছুরের এ রোগ হয়। জন্মের সময় নাভির মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়। তাছাড়া বাছুরের নাভি অপরিষ্কার ছুরি দিয়ে কাটার ফলে রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়ে রোগের সৃষ্টি হয়।
রোগের অন্যান্য নাম: নাভী ফোলা, নাভী পাকা, ন্যাভাল ইল, জয়েন্ট ইল, ইত্যাদি।
রোগের কারণ: ব্যাকটেরিয়া।

রোগের লক্ষণ

১. জ্বর হয়। বাছুরের নাভি ফুলে যায়, হাত দিলে গরম ও শক্ত অনুভব হয়।
২. নাভিতে ঘা ও পুঁজ হয়। নাভিতে চাপ দিলে রক্ত মেশানো তরল পদার্থ বের হয়।
৩. বাছুর মুখ দিয়ে নাভি চাটে ও ঘন ঘন প্রস্রাব করে।
৪. আক্রান্ত বাছুরের পায়ের গিরা সমূহ ফুলে যায় এবং খুড়িয়ে হাঁটে।
৫. আক্রান্ত বাছুর নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
৬. বাছুর দুগ্ধপান থেকে বিরত থাকে।

প্রতিকার

১. বাছুরের বাসস্থান পরিষ্কার ও শুকনা রাখতে হবে। গাভীকে বাছুরের নাভি চাটা থেকে বিরত রাখতে হবে।
২. গাভীর প্রস্রাবের স্থান পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে।
৩. জন্মের পর জীবাণুমুক্ত ছুরি দিয়ে নাভি কেটে আয়োডিন দিয়ে মুছে জীবাণুনাশক পাউডার লাগাতে হয়।
৪. নাভি পেকে গেলে একটু কেটে সম্পূর্ণ পুঁজ বের করতে হবে এবং ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ধুয়ে সালফানিলামাইড পাউডার বা এন্টিসেপটিক ক্রিম লাগাতে হবে।
   অথবা, গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক বা সালফোনামাইড জাতীয় ঔষধ ইনজেকশনের মাধ্যমে দিতে হবে।

৮) সালমোনেলোসিস (Salmonellosis)

বাছুরের এ রোগ হয়। একে প্যারাটাইফয়েডও বলা হয়। খাদ্য বা মলের সাহায্যে রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়ে এ রোগ সৃষ্টি করে। বয়স্ক গবাদি প্রাণি, ইঁদুর এবং মাছি রোগজীবাণু বহন করে বাছুরকে সংক্রামিত করতে পারে।

রোগের কারণ: ব্যাকটেরিয়া।

রোগের লক্ষণ

১. শরীরের তাপমাত্রা, নাভির গতি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়।
২. গবাদি প্রাণি দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা করে। পায়খানা তরল, হলুদ রং এর এবং রক্ত মিশ্রিত হয়।
৩. নাক, মুখ দিয়ে তরল শ্লেষ্মা এবং মুখ হতে ফেনা ঝরে।
৪. শরীরের বিভিন্ন স্থানের গিরা ফুলে যায়। পানির স্বল্পতা দেখা দেয়।
৫. নিউমোনিয়ার সাথে কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. স্বাস্থ্যসম্মত লালন পালন ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
২. নবজাত বাছুরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
৩. আক্রামণকারী ব্যাকটেরিয়া দমনের জন্য প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম ক্লোরামফেনিকল ৬-১২ ঘন্টা পর পর ৩ দিন ইনজেকশন আকারে দিতে হবে।
৪. অন্ত্র প্রদাহের জন্য প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম নাইট্রোফিউরাজন ৫ দিন খাওয়াতে হবে।
৫. ডায়রিয়া বন্ধের জন্য অ্যাসট্রিনজেন্ট ঔষধ খাওয়াতে হবে। পানির স্বল্পতা রোধে স্যালাইন দেয়া যেতে পারে।
৬. শরীরে তাপমাত্রা বেশি থাকলে ৫% সোডিয়াম বাইকার্বনেট শিরায় ইনজেকশন আকারে দিতে হবে। অথবা গবাদি প্রাণি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে দলগতভাবে গবাদি প্রাণির বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গবাদি প্রাণিতে যেসব রোগ হয় তাদের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বলে। তড়কা, বাদলা, ওলান ফোলা, গলা ফোলা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি গবাদি প্রাণির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ দমনের জন্য প্রতিষেধক টিকা সুস্থ্য অবস্থায় ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো সময়মত প্রযোগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জন্মের সাথে সাথে বাছুর কোন রোগে আক্রান্ত হয়?
(ক) নিউমোনিয়া (খ) গলাফুলা
(গ) কাফস্কাওয়ার (ঘ) বাদলা রোগ

২। কোন রোগ হলে গবাদি প্রাণির মাংসপেশী ফুলে যায়?
(ক) তড়কা (খ) বাদলা
(গ) গলাফুলা (ঘ)ওলান ফোলা

৩। বর্ষাকালে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়?
(ক) তড়কা (খ) বাদলা
(গ) নিউমোনিয়া (ঘ) গোবসন্ত

৪। প্যারাটাইফয়েড বলা হয় কোন রোগটিকে?
(ক) তড়কা (খ) নিউমোনিয়া
(গ) ওলান ফোলা (ঘ) সালমোনেলোসিস

পাঠ-১৩.৪ গবাদি প্রাণির পরজীবীজনিত রোগ (Parasitic disease)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরজীবীজনিত রোগ কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- পরজীবীজনিত রোগগুলো কি কি তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন পরজীবীজনিত রোগগুলোর লক্ষন, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরজীবীজনিত রোগ, অন্ত:পরজীবী, গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, বহি:পরজীবী, উকুন, মাছি

গবাদি প্রাণির পরজীবীজনিত রোগ (Parasitic disease)

যেসব প্রাণী অন্য প্রাণীর ওপর আশ্রয় নিয়ে জীবনধারন করে তাকে পরজীবী বলে। গবাদি প্রাণির পরজীবী দ্বারা যেসব রোগ হয় তাদেরকে পরজীবীজনিত রোগ বলে। বহু পরজীবী গৃহপালিত গবাদি প্রাণির ওপর জীবনধারণ করে। এসব পরজীবী যে সব প্রাণীর ওপর জীবনধারন করে তাদের কোনো উপকার করে না বরং অনেক ক্ষতিসাধন করে থাকে। গবাদি প্রাণির পরজীবীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অন্তঃপরজীবী ও বহিঃপরজীবী।

১) অন্তঃপরজীবী

এরা কৃমি নামে পরিচিত। এরা পোষক দেহের ভিতরে অবস্থান করে। এদেশে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ গৃহপালিত গবাদি প্রাণি কৃমিতে আক্রান্ত হয়। অন্তঃপরজীবীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- গোলকৃমি, ফিতাকৃমি ও পাতাকৃমি।

গোলকৃমি

গবাদি প্রাণিকে বহু ধরনের গোলকৃমি আক্রমণ করে থাকে। যেমন- ছোট বাদামি পাকস্থলীর কৃমি, ছোট চুলকৃমি, ছোট অন্ত্রনালির কৃমি, বক্রকৃমি, চিকনগলা অন্ত্রনালির কৃমি, বড় পাকস্থলির কৃমি, সুতাকৃমি, ক্ষুদ্রপিত্ত কৃমি, কেঁচোকৃমি, বা বড় গোলকৃমি, ফুসফুসের কৃমি।

রোগের লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণি পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত হয়।
২. গবাদি প্রাণির ক্ষুধামন্দা দেখা যায়।
৩. শরীরের ওজন কমতে থাকে।
৪. গায়ের লোম রুক্ষ দেখায়।
৫. পাতলা পায়খানা হয়।
৬. রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং গবাদি প্রাণি মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

১. কৃমির আক্রমণে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক কৃমিনাশক ঔষধ (যেমন ফেনবেন্ডাজোল, লিভামিসোল, মিবেল অ্যালবেন্ডাজল) খাওয়াতে হবে।
২. বাছুরের বয়স ৩ মাস হলেই নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
৩. গোয়াল ঘরের গোবর ও আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখতে হবে।
৪. গোয়াল ঘর শুকনা রাখতে হবে।
৫. স্যাঁতস্যাঁতে কাদা পানিযুক্ত মাঠে গবাদি প্রাণিকে চড়ানো যাবে না।

ফিতাকৃমি

এসব কৃমি সাধারণত গবাদি প্রাণির অন্ত্রনালিতে বাস করে। ফিতাকৃমি দেখতে ফিতার মত বেশ লম্বা।

রোগের লক্ষণ

১. অধিক কৃমি অন্ত্রনালিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে গবাদি প্রাণির মৃত্যুর কারণ হয়।
২. হজমে বিঘ্ন ঘটে এবং গবাদি প্রাণির পেট ফুলা, উদরাময়, দুর্বলতা, স্বাস্থ্যগত অবস্থার অবনতি হয়ে থাকে।
৩. মস্তিষ্কে কৃমির শূক জলকোষের সৃষ্টি করে ফলে পশুতে গিড নামক রোগ হয়।
৪. গিড হলে গবাদি প্রাণি মাথা বাঁকা করে ঘুরতে থাকে।
৫. মস্তিষ্কে যে যায়গায় গিড হয় সে জায়গার হাড় নরম হয়ে যায়।

চিকিৎসা

১. কৃমিনাশক ঔষধ যেমন- বেনাজল, হেলমেক্স, এলডাজোল ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।
২. গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাতাকৃমি

গৃহপালিত গবাদি প্রাণিতে ৩ ধরনের পাতাকৃমি হয় থাকে। যেমন- যকৃতের পাতাকৃমি, পাকস্থলীর পাতাকৃমি ও রক্তের পাতাকৃমি।

রোগের লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণির হজমে বিঘ্ন ঘটে এবং দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল ত্যাগ করে।
২. যকৃতে পাতাকৃমি আক্রমণে যকৃৎ ও পিত্তনালী এবং বিভিন্ন অঙ্গে প্রদাহ হয়।
৩. গবাদি প্রাণি দুর্বল হয়ে উৎপাদনশক্তি হারিয়ে ফেলে।
৪. অধিক কৃমির আক্রমণে বাছুর তাড়াতাড়ি মারা যায়।
৫. নাক হতে শ্লেষ্মার সাথে রক্ত ঝরে।
৬. নাসারন্ধ্রে গোটা উঠে নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়।
৭. গবাদি প্রাণির শ্বাস কষ্ট হয় এবং নাক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
৮. পাকস্থলীর পাতাকৃমির আক্রমণে হজমের ব্যাঘাত ঘটে।
৯. দুর্গন্ধযুক্ত রক্তমিশ্রিত তরল পায়খানা হয়।
১০. গবাদি প্রাণির রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ফলে গবাদি প্রাণি দুর্বল হয় এবং গবাদি প্রাণির খাওয়া কমে যায়।
১১. আক্রান্ত গবাদি প্রাণির থুতনির নিচে ফুলা দেখা যায়।
১২. রক্তে পাতাকৃমির আক্রমণে নাকের রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চিকিৎসা

১. ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে।
২. গবাদি প্রাণিকে কৃমিনাশক ঔষধ (যেমন- ফেসিনেক্স, বেনাজল, অ্যালডাজল, হেলমেক্স ইত্যাদি) খাওয়াতে হবে।

ফ্যাসিওলিয়াসিস (Fascioliasis)

রোগের কারণঃ কলিজা কৃমি।

রোগের লক্ষণ

১. দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়।
২. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
৩. গবাদি প্রাণির দৈহিক ওজন কমে যায়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. নিচু জমি ও ড্রেনের ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
২. কৃমির মাধ্যমিক পোষক শামুকের সংখ্যা হ্রাস ও ধ্বংস করতে হবে।
৩. কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। অথবা গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা নিতে হবে।

হ্যাম্পসোর (Humpsore)

রোগের কারণ: গোল কৃমি।

রোগের লক্ষণ:

১. গবাদি প্রাণিরচুড়ায়, কাঁধে, কানের গোড়ায় ও শিং এর গোড়ায় ক্ষত হয়।
২. ক্ষতস্থান চুলকায়। শক্ত খুঁটি বা গাছের সাথে গবাদি প্রাণি ঘা ঘষতে থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

১. ক্ষতস্থানে মাছি বসতে না পারে সে জন্য ক্ষতস্থান ঢেকে রাখতে হবে।
২. নেগুভোন বা এসানটাল ক্ষতস্থান লাগাতে হবে।

মনিজিয়াসিস

রোগের কারণ: ফিতা কৃমি

রোগের লক্ষণ:

১. পেটের পীড়া দেখা দেয়।
২. হজমে বিঘ্ন ঘটে এবং পেট ফুলে যায়।
৩. শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় ও কৃশকায় হয় ।
৪. শরীরে পানি জমে এবং রক্তশুন্যতা দেখা দেয়।
৫. মলের সাথে ভাতের মত দেখতে কৃমির টুকরা অংশ বের হয়ে আসে।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. গবাদি প্রাণি চারণক্ষেত্রে চরানো যাবে না।
২. লেড আর্সিনেট ২০-২৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। অথবা নিক্লোসেমাইড ৫০-৭৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রয়োগ করতে হবে।

এন্টেরিক সিস্টোসোমিয়াসিস (Enteric schistosomiasis)

রোগের কারণ: পাতা কৃমি

রোগের লক্ষণ:

১. আক্রান্ত গবাদি প্রাণি পানির মতো পাতলা পায়খানা করে।
২. দেহের ওজন আস্তে আস্তে কমে যায়।
৩. পানিশূন্যতা ও রক্তশূন্যতা দেখা যায়।
৪. চোখ কোটরে ঢুকে যায় ও পিপাসা বেড়ে যায়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:

১. নিচু জমি বা ড্রেনের পাশর ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
২. কৃমির মাধ্যমিক পোষক শামুকের সংখ্যা হ্রাস বা ধ্বংস করতে হবে।
৩. কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।

বহিঃপরজীবী

এ ধরনের পরজীবী পোষকের দেহের বাইরে থাকে। গবাদি প্রাণির ত্বকে বহিঃদেহের পরজীবী বাস করে গবাদি প্রাণির যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এ জাতীয় পরজীবীর আক্রমণে গবাদি প্রাণির চামড়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গৃহপালিত গবাদি প্রাণির বহু ধরনের বহিঃদেহের পরজীবীর আক্রমণ হয়ে থাকে। যেমন- আঠালি, উকুন, মাছি, মাইটস এবং কেডস ইত্যাদি।

আঠালি (Tick)

বিভিন্ন ধরনের আঠালি গৃহপালিত গবাদি প্রাণিকে আক্রমণ করে। আঠালি পোষক বা প্রাণীর ত্বকে বাস করে। কোনো কোনো আঠালি একটি পোষক বা প্রাণীর দেহে বাস করে। তাকে একপোষক আঠালি বলে। এরা গবাদি প্রাণির রক্ত চুষে খায়। ফলে রক্তশূন্যতা দেখা যায়।

উকুন (Pediculus)

সব ধরনের গবাদি প্রাণিতে বহিঃদেহের পরজীবী পাওয়া যায়। গবাদি প্রাণিতে দু'ধরনের উকুন হয়। যেমন- ক) কামড়ানো উকুন খ) চোষা উকুন। কামড়ানো উকুনের আক্রমণে গবাদি প্রাণির শরীর খুব চুলকায়। ফলে গবাদি প্রাণি শক্ত জিনিসের সাথে শরীর ঘষে ক্ষতের সৃষ্টি করে। চোষা উকুন গবাদি প্রাণির ত্বকের রক্ত চুষে খায় এবং গবাদি প্রাণি রক্তশূন্যতায় ভোগে।

মাছি

গৃহপালিত প্রাণিকে বিভিন্ন ধরনের মাছি আক্রমণ করে থাকে। যেমন- মহিষের মাছি, আস্তাবলের মাছি, ঘোড়ার মাছি, উড়ন্ত মাছি ইত্যাদি। মাছি গবাদি প্রাণির ত্বকে বসে রক্ত চুষে খায়। মাছি সাধারণত গবাদি প্রাণির দেহের ক্ষতে বসে সেখানে ডিম পাড়ে, ডিম হতে লার্ভা হয়, ফলে মাছি যাতে পচন ধরে, ক্ষত শুকায় না এবং ক্ষতে বিভিন্ন রোগজীবানু সংক্রামিত হয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। ক্ষতে বসলে সেসব স্থান চুলকায়। গবাদি প্রাণি সেসব স্থান শক্ত কিছুর সাথে ঘষে বা জিহ্বা দিয়ে চেটে ঘা আরও বাড়িয়ে দেয়। গবাদি প্রাণির খাওয়া এবং দুধ প্রদানে মাছি ব্যাঘাত ঘটায়।

মাইটস

মাইটস গবাদি প্রাণির শরীরের সংক্রামক চর্মরোগের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত গবাদি প্রাণির সংস্পর্শে বা গবাদি প্রাণির ব্যবহার্য আসবাপত্র বা বিছানার মাধ্যমে পরজীবী সুস্থ গবাদি প্রাণিতে সংক্রামিত হয়ে বিভিন্ন চর্মরোগের সৃষ্টি করে। গবাদি প্রাণির স্বাস্থ্যহানি ঘটে, কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনক্ষমতা কমে যায়। গবাদি প্রাণির শরীর চুলকায়, ফলে গবাদি প্রাণি শক্ত জিনিসের সাথে শরীর ঘষায় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

কেডস

ছাগল ও ভেড়ায় এ জাতীয় পরজীবী বেশি পাওয়া যায়। এরা আঠালির মত গবাদি প্রাণির রক্ত চুষে খায় এবং আক্রমণে শরীর খুব চুলকায়। ফলে শক্ত বস্তুর সাথে ঘষলে ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ

১. বহিঃদেহের পরজীবীর আক্রমণ হতে রক্ষা করতে হলে গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত শরীর ঘষে গোসল করাতে হবে।
২. বহিঃদেহের পরজীবী ধ্বংসের জন্য টক্সেফেন, নেগুভন, এসানটল, নিওসিডোল ইত্যাদি ঔষধ স্প্রে করা যেতে পারে। প্রতি ২.৫ লিটার পানিতে ৪-৫ গ্রাম মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে গবাদি প্রাণির দেহ ধুয়ে দিতে হবে।
৩. গবাদি প্রাণি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. ঘরের মেঝেতে এবং চারপাশে ফিনাইল, নেগুভন বা আইওসান মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

মেন্‌জ (Mange)

রোগের কারণ: মাইট

রোগের লক্ষণ

১. দেহে তীব্র চুলকনি হয় এবং জ্বালা করে।
২. অতিরিক্ত চুলকানির ফলে গবাদি প্রাণির চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
৩. ক্ষতে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের জন্য চামড়ায় ঘা হয়।
৪. ঘায়ে চটা ধরে চুলসহ উঠে আসে।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. আক্রান্ত গবাদি প্রাণিকে লিনডেন (০.২%) পানিতে মিশিয়ে ২-৩ দিন গোসল করালে মেঞ্জ ভালো হয়।
২. ব্রোমসাইক্লিন স্প্রে বা ডাস্টিং হিসেবে প্রয়োগ করেও মেঞ্জ রোগের চিকিৎসা করা যায়। অথবা গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মায়াসিস (Myiasis)

রোগের কারণঃ মাছি

রোগের লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণি রক্তস্বল্পতায় ভোগে।
২. খাদ্য গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে। গবাদি প্রাণির ওজন দিন দিন কমতে থাকে।
৩. শরীরে ঘা হয় এবং শুকাতে দেরি হয়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

১. ক্ষতস্থান ভালভাবে ধুয়ে সকেটিল পাউডার লাগতে হবে।
২. মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ঘায়ের চারিদিকে তারপিন তেল দৈনিক ৩-৪ বার প্রয়োগ করতে হবে।

প্রোটোজোয়াজনিত রোগ (Protozoal disease)

প্রোটোজোয়া এককোষি জীব। প্রোটোজোয়া গবাদি প্রাণির দেহে বহু রোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- বাবেসিয়োসিস বা রেড ওয়াটার ফিভার, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, এনাপ্লাজমোসিস, ককসিডিওসিস ইত্যাদি।

বাবেসিয়াসিস (Babesiosis)

বাবেসিয়া নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা গবাদি প্রাণিতে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগ রেড ওয়াটারফিভার নামেও পরিচিত। আঠালি দ্বারা এ রোগের জীবাণু সংক্রামিত হয়।

প্রচলিত নামঃ রক্ত প্রস্রাব

রোগের লক্ষণ

১. শরীরের তাপমাত্রা এবং নাড়ির স্পন্দন বেড়ে যায়।
২. প্রস্রাবের রং কালচে লাল হয়।
৩. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, শ্বাসকষ্ট হয়।
৪. জাবর কাটা বন্ধ করে, গবাদি প্রাণির হঠাৎ জ্বর হয়।
৫. সময় মত চিকিৎসা না করালে অধিকাংশ আক্রান্ত গবাদি প্রাণিই মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

১. গবাদি প্রাণির বাসস্থান নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
২. গবাদি প্রাণি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করতে হবে।
৩. নিওসিডল ৪০ ডব্লিউ পি ৪-৫ গ্রাম, ২.৫ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গবাদির গায়ে স্প্রে করতে হবে।
৪. জরুরীভিত্তিতে সামান্য বরিক পাউডার ও ফিটকারী মিশ্রিত পানি গুলে খাওয়ালে রোগের কিছুটা উপশম হয়।
৫. বেবেসান ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

ককসিডিওসিস (Coccidiosis)

আইমেরিয়া নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা রোগ সংঘটিত হয়। সাধারণত বাছুরে এ রোগ বেশি হয়। স্যাঁসস্যাঁতে নিচু জায়গায় রোগজীবাণু বেঁচে থাকে। রোগজীবাণু অন্ত্রনালীতে প্রবেশ করে অন্ত্রনালীর দেয়ালে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

রোগের কারণঃ প্রোটোজোয়া।

প্রচলিত নামঃ রক্ত আমাশয়

রোগের লক্ষণ

১. দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়।
২. পায়খানা রক্ত ও মিউকাস (আম) মেশানো থাকে।
৩. খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং দুর্বল হয়ে মারা যায়।
৪. মলত্যাগের সময় গবাদি প্রাণি ঘন ঘন কোথ দেয় ও ব্যথা অনুভব করে।
৫. গবাদি প্রাণির শ্বাসকষ্ট দেখা যায়।

চিকিৎসা

১. গবাদি প্রাণির বাসস্থান, খাবার ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
২. গোয়াল ঘর মাঝে মাঝে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
৩. সালফাডিমিডিন বড়ি দৈনিক ৩ বার খাওয়াতে হবে। অথবা, সালফানিলামাইড গ্রুপের যে কোনো ঔষধ খাওয়ানো যেতে পারে।
৪. গবাদি প্রাণি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেতে হবে।

ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis)

ট্রাইকোমোনাস ফিটাস নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগ যৌন সংক্রান্ত রোগ, যার ফলে গাভীর গর্ভপাত, অস্থায়ী প্রজননহীনতাসহ অন্যান্য প্রজনন সংকট দেখা দেয়। আক্রান্ত গবাদি প্রাণির মাধ্যমে এক গবাদি প্রাণি হতে অন্য গবাদি প্রাণিতে রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়ে রোগের সৃষ্টি করে।

রোগের কারণঃ প্রোটোজোয়া।

রোগের লক্ষণ

১. আক্রান্ত গাভীর ১-৮ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত হয়।
২. গাভী এবং ষাঁড়ের যৌনাঙ্গে প্রদাহ হয়।
৩. ষাঁড়ের লিঙ্গদ্বার ফুলে যায় এবং প্রদাহ হয়।
৪. যোনিমুখ ও তার চারপাশে ফুলে যায় ও লাল হতে দেখা যায়।
৫. গাভীর ঋতুচক্রে অনিয়ম দেখা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

১. গবাদি প্রাণি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক রোগের চিকিৎসা করাতে হবে।
২. কিছুদিন গাভীর যৌন সঙ্গম বন্ধ রাখতে হবে।
৩. জীবাণুমুক্ত ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করাতে হবে।
৪. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ রোগ এড়ানো যায়।
৫. ডাইমেট্রিডাজল আক্রন্ত গবাদি প্রাণির শিরার মাধ্যমে প্রয়োগ করাত হবে।
৬. আক্রান্ত ষাঁড়কে খোজা করে কাজে ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে গবাদি প্রাণির বিভিন্ন পরজীবীজনিত রোগের নাম, লক্ষন, চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

যে সব ক্ষুদ্র প্রাণী বড় প্রাণীরদেহে আশ্রয় নিয়ে জীবন ধারন করে তাদেরকে পরজীবী বলে। গবাদি প্রাণির দেহের ভিতরে ও বাইরে দুই ধরনের পরজীবী দেখা যায়। দেহের বাইরে চামড়ার মধ্যে উঁকুন, আটালি ও মাইট হয়ে থাকে। দেহের ভিতরে গোলকৃমি, ফিতাকৃমি ও পাতাকৃমি দ্বারা গবাদিপ্রাণি বেশি আক্রান্ত হয়। এরা গবাদি প্রাণি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্যে ভাগ বসায়। অনেক কৃমি গবাদি প্রাণির শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয়। পরজীবীগুলো গবাদি প্রাণির কোনো উপকার করে না বরং অনেক ক্ষতিসাধন করে। তাই পরজীবীর হাত থেকে গবাদি প্রাণিকে রক্ষার জন্য খামারীদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শতকরা কতভাগ গৃহপালিত প্রাণি কৃমিতে আক্রান্ত হয়?
(ক) ৫০ ভাগ (খ) ৬০ ভাগ
(গ) ৭০ ভাগ (ঘ) ৮০ ভাগ

২। কোন ধরনের কৃমিতে আক্রান্ত হলে গবাদি প্রাণিতে গিড নামক রোগ হয়?
(ক) গোল কৃমি (খ) ফিতা কৃমি
(গ) পাতা কৃমি (ঘ) সুতা কৃমি

৩। Hump sore কোন কৃমির কারনে হয়?
(ক) গোল কৃমি (খ) কলিজ কৃমি
(গ) ফিতা কৃমি (ঘ) পাতা কৃমি

৪। রেড ওয়াটার ফিভার কোনটিকে বলা হয়?
(ক) ককসিডিওসিস (খ) ট্রাইকোমোনিয়াসিম
(গ) বাবেসিয়াসিস (ঘ) তড়কা

৫। আইমেরিয়া নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা কোন রোগ সংঘটিত হয়?
(ক) ককসিডিওসিস (খ) বাবেসিয়োসিস
(গ) ট্রাইকোমোনিয়াসিস (ঘ) ফ্যাসিওলিয়াসিস

পাঠ-১৩.৫ গবাদি প্রাণির অপুষ্টিজনিত রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদি প্রাণির অপুষ্টিজনিত রোগ কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- গবাদি প্রাণির ভিটামিনের অভাব জনিত রোগের নাম, অভাবজনিত লক্ষন এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অপুষ্টিজনিত রোগ, ভিটামিন, চিকিৎসা

গৃহপালিত প্রাণির দেহ গঠন, কার্যক্ষমতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যেও প্রয়োজন। সুষম খাদ্যে আমিষ স্নেহ, পদার্থ, খনিজ পদার্থ, শর্করা ও ভিটামিন থাকে। গবাদি প্রাণির খাদ্যে যে কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণি দুর্বল হয়ে যায় এবং গবাদি প্রাণির কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
২. দুধ ও মাংস উৎপাদন কমে যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

১. গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত সবুজ কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা, অঙ্কুরোদগমিত শস্যদানা খাওয়ালে ভিটামিন ই এর অভাব হয় না।
২. দানাদার খাদ্যে কৃত্রিম দানাদার 'ই' সমৃদ্ধ মিশ্রণ মিশিয়ে গাভীকে খাওয়াতে হবে।

ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

গবাদি প্রাণির দেহে সাধারণত ১. ভিটামিন 'এ' ২. ভিটামিন 'ডি' ৩. ভিটামিন 'কে' ৪. ভিটামিন 'ই' ৫. ভিটামিন 'বি-১২' ইত্যাদি ভিটামিনের অভাব দেখা যায়। নিচে এসব ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভিটামিন এ

সবুজ কাঁচা ঘস, সবুজ লতা-পাতা এবং হলুদ রং এর শাকসবজিতে প্রচুর কেরোটিন থাকে যা গবাদি প্রাণির দেহে ভিটামিন এ তে রুপান্তিরিত হয়। যে সব গবাদি প্রাণি মাঠে চরে প্রচুর কাঁচা ঘাস লতা পাতা খায় এরা প্রচুর ভিটামিন এ পায়। যেসব গবাদি প্রাণিকে ঘরে বেঁধে শুধু খড়, বিচালি এবং দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয় সেসব গবাদি প্রাণিতে ভিটামিন এ এর অভাব দেখা দেয়।

অভাবজনিত লক্ষণ

১. গবাদি প্রাণি রাতে দেখতে পায় না বা অল্প আলোতেও দেখতে পায় না, একে রাতকানা রোগ বলা হয়।
২. গবাদি প্রাণির মাংসপেশির অসমন্বয়তা দেখা দেয়। ফলে গবাদি প্রাণির হাঁটাচলায় অসুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মাংসপেশীর খিচুনি দেখা যায়।
৩. লোম খসখসে হয়।
৪. ত্বক মসৃণতা হারায় এবং ত্বকে তুষ সদৃশ আঁশ পড়ে।
৫. আক্রান্ত গবাদি প্রাণির চোখ ফুলে যায়। চোখে সাদা পিঁচুটি জমা হয়।
৬. সময়মতো চিকিৎসা না করালে গবাদি প্রাণি অন্ধ হয়ে যায়।
৭. প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিকার

১. বাছুরকে জন্মের সাথে সাথে গাভীর প্রথম দুধ বা শালদুধ খাওয়াতে হবে।

২. গবাদি প্রাণিকে প্রচুর সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে।
৩. গবাদি প্রাণির দানাদার খাদ্যে কৃত্রিম ভিটামিন এ সমৃদ্ধ মিশ্রণ মিশিয়ে নিয়মিত গবাদি প্রাণিকে খাওয়াতে হবে।

ভিটামিন ডি

গবাদি প্রাণির ত্বকে সূর্যরশ্মি পড়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভিটামিন ডি তৈরি হয় যা চামড়ার মাধ্যেমে গবাদি প্রাণির দেহে শোষিত হয়। যে সব গবাদি প্রাণি মাঠেঘাটে চরে বেড়ায় এবং প্রচুর সূর্যরশ্মি পায় তাদের দেহে সাধারণত ভিটামিন ডি এর অভাব হয় না। তবে ঘরে বেঁধে পালা পশুতে ভিটামিন ডি এর অভাব দেখা দেয়। সামুদ্রিক মাছ যেমন হ্যালিবাট , শার্ক, কড জাতীয় মাছের যকৃতে প্রচুর ভিটামিন ডি থাকে।

অভাবজনিত লক্ষণ

১. বাছুরের হাড় এবং দাঁতের স্বাভাবিক গঠন হয় না।
২. হাড়ে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ ঠিকমতো হয় না ফলে বাছুরের হাড় নরম এবং বাঁকা হয়।
৩. বয়স্ক গবাদি প্রাণির হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয় যাকে অসটিওমেলেসিয়া বা অস্থি কোমলতা রোগ বলে।
৪. গবাদি প্রাণির ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয় এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন হ্রাস পায়।
৫. গবাদি প্রাণির কাজ করার ক্ষমতা থাকে না।
৬. গবাদি প্রাণির প্রজনন ক্ষমতা ও উর্বরতা কমে যায়।

প্রতিকার

১. দানাদার খাদ্যের সাথে সামুদ্রিক মাছের যকৃতের তেল মিশিয়ে গবাদি প্রাণিকে খাওয়ালে এই ভিটামিনের অভাব দূর করা যায়।
২. গবাদি প্রাণির দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত কৃত্রিম ভিটামিন ডি যুক্ত মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে গবাদি প্রাণির ভিটামিন ডি এর অভাব হয় না।
৩. গবাদি প্রাণি যেন পর্যাপ্ত সুর্যালোক পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতিদিন ৭-১২ ইউনিট ভিটামিন ডি ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করতে হবে। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করলে বিষক্রিয়া হতে পারে।
৫. পর্যাপ্ত পরিমাণে রোদে শুকানো ঘাস বা হে সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন 'ই'

সাধারণত টাটকা সবুজ ঘাস লতা-পাতা এবং অঙ্কুরোদগমিত শস্যদানা, অঙ্কুরজাত তেলবীজে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই পাওয়া যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

১. বাছুরের মাংসপেশীর বৈকল্য দেখা দেয়।
২. অস্থির মাংসপেশীর সংকোচন অস্বাভাবিক চলাফেরা এবং পেশী গঠনে অসামঞ্জস্য দেখা যায়।
৩. গবাদি প্রাণির প্রজননক্ষমতা কমে যায়, এমনকি গবাদি প্রাণির বন্ধ্যাত্বও হতে পারে।

প্রতিকার

১. গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত সবুজ কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা অঙ্কুরোদগমিত শস্যদানা খাওয়ালে ই ভিটামিনের অভাব হবে না।
২. গাভীর দানাদার খাদ্যে কৃত্রিম ভিটামিন ই সমৃদ্ধ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে গাভী এবং গাভীর দুধের মাধ্যমে প্রচুর ভিটামিন ই পাবে।
৩. খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সেলেনিয়াম যোগ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণীকক্ষে গবাদিপমুর বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের নাম, অভাবজনিত লক্ষন এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

গবাদি প্রাণির খাদ্যে যে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে পমু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অপুষ্টিজনিত রোগের কারনে গবাদি প্রাণি দুর্বল হয়ে যায়, কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় এবং দুধ ও মাংসের উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য গবাদি প্রাণির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কেরেটিন গবাদি প্রাণির দেহে কোন ভিটামিনে রুপান্তরিত হয়?
(ক) ভিটামিন এ (খ) ভিটামিন বি
(গ) ভিটামিন সি (ঘ) ভিটামিন ডি

২। রাতকানা রোগ কিসের অভাবে হয়?
(ক) ভিটামিন বি (খ) ভিটামিন সি
(গ) ভিটামিন এ (ঘ) ভিটামিন ডি

৩। সূর্যরশ্মিতে কোন ভিটামিন থাকে?
(ক) ভিটামিন এ (খ) ভিটামিন বি
(গ) ভিটামিন সি (ঘ) ভিটামিন ডি

৪। ঘরে বেধে পালা গবাদি প্রাণিতে কোন ভিটামিনের অভাব দেখা যায়?
(ক) ভিটামিন সি (খ) ভিটামিন ডি
(গ) ভিটামিন এ (ঘ) ভিটামিন বি

৫। অস্থি কোমলতা রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয়?
(ক) ভিটামিন এ (খ) ভিটামিন বি
(গ) ভিটামিন সি (ঘ) ভিটামিন ডি

পাঠ-১৩.৬ ছাগলের রোগ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ছাগলের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুস্থ ছাগলের বৈশিষ্টগুলো কি কি তা জানতে পারবেন।
- ছাগলের খামারের জৈব নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ছাগল, ব্যবস্থাপনা, টিকা, জৈব নিরাপত্তা

ছাগলের রোগ ব্যবস্থাপনা

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মুক্তভাবে ছাগল প্রতিপালনের তুলনায় আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন অনেক বেশি ঝুকিপূর্ণ। এ ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা ও প্রযুক্তির সমন্নয় না ঘটালে খামারীকে বিস্তর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এটা একটি বাস্তব উপলব্ধি। এজন্য ছাগলের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যর প্রতি খামারীকে স্বতন্ত্র ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। ছাগলের খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই বিভিন্ন রোগ দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে খামার থেকে লাভের আশা করা যায় না। খামারে ছাগল আনার পর থেকে প্রতিদিনই প্রতিটি ছাগলের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথম পাঁচ দিন সকাল ও বিকালে দুবার থার্মোমিটার দিয়ে ছাগলের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। হঠাৎ কোনো রোগ দেখা মাত্রই গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তীব্র শীতের সময় ছাগী বা বাচ্চাদের গায়ে চট পেঁচিয়ে দেয়া যেতে পারে। মাচার নিচ এবং ঘর প্রতিদিন সকালে পরিস্কার করতে হবে এবং কর্মসূচি অনুযায়ী জীবাণুনাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুস্থ ছাগলের বৈশিষ্ট্য

সুস্থ ছাগলের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০-৯০ বার, শ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ২৫-৪০ বার এবং তাপমাত্রা ৩৯.৫° সেঃ হওয়া উচিত। সুস্থ ছাগল দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে, মাথা সবসময় উঁচু থাকে, নাসারন্ধ্র থাকবে পরিস্কার, চামড়া নরম, পশম মসৃণ ও চকচকে দেখাবে এবং পায়ু অঞ্চল থাকবে পরিচ্ছন্ন।

ছাগল সুস্থ রাখতে যেসব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

কর্মসূচি অনুযায়ী টিকা প্রদান: ভাইরাসজনিত রোগ যেমন এনথ্রাক্স ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি খুবই মারাত্মক বলে এগুলোর বিরুদ্ধে যথারীতি টিকা প্রদান করতে হবে। যেসব ছাগীকে পূর্বে পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদি টিকা দেয়া হয়নি তাদেরকে গর্ভের ৫ম মাসে উক্ত ভ্যাকসিনগুলি দিতে হবে। বাচ্চার বয়স যখন ৫ মাস তখন তাকে পিপিআর ভ্যাকসিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন দিতে হবে।

কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ: সকল ছালকে নির্ধারিত মাত্রায় বছরে দুইবার কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করতে হবে। কৃমিনাশক কর্মসূচি অনুসরণের জন্য গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ছাগলের খামারের জৈব নিরাপত্তা

খামার এলাকায় বেড়া বা নিরাপত্তা বেস্টনী এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সেখানে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি, শেয়াল- কুকুর ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশপথে ফুটপাতে বা পা ধোয়ার জন্য ছোট চৌবাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের আগে খামারে গমনকারী তার জুতা/পা ডুবিয়ে জীবাণু মুক্ত করবেন। খামারের জন্য সংগৃহিত নূতন ছাগল সরাসরি খামারে পূর্বে বিদ্যমান ছাগলের সাথে রাখা যাবে না। নতুন আনীত ছাগলদের স্বতন্ত্র ঘরে সাময়িক ভাবে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ধরনের ঘরকে পৃথকীকরণ ঘর বা আইসোলেশন শেড বলে। অন্ততপক্ষে দুই সপ্তাহ এই শেডে রাখা বিশেষ জরুরি। এসব ছাগলের জন্য প্রাথমিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে এদেরকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। এজন্য বহিঃপরজিবী এবং আন্তঃপরজিবীর জন্য কার্যকর কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। চর্মরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ছাগলকে ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে গোসল করাতে হবে। আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোনো রোগ না দেখা দেয় তাহলে প্রথম পিপিআর রোগের এবং সাত দিন পর গোটপক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। শেষ টিকা প্রদানের সাত দিন পর এসব ছাগলকে মূল খামারে নেয়া যেতে পারে। প্রদিদিন সকাল এবং বিকালে ছাগলের ঘর পরিষ্কার করতে হবে। কোনো ছাগল যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে আলাদা করে আইসোলেশন শেডে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনো ছাগল মারা যায় তবে অবশ্যই তার কারণ শনাক্ত করতে হবে। ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। মৃত ছাগলকে খামার থেকে দূরে নিয়ে মাটির গভীরে পুঁতে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের ব্যবহার্য সকল সরঞ্জামাদি ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে জীবানু মুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে দলগতভাবে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ছাগলের খামারের জৈব নিরাপত্তা এবং ছাগলের রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ছাগল পরিষ্কার পরিছন্ন পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। এদের বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। ছাগল সবসময় শুকনো ও উঁচুস্থান পছন্দ করে। ছাগলের যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল লাখতে হবে। কারণ ঠান্ডায় এরা নিউমোনিয়াসহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। তাই শীতের সময় মেঝেতে ধানের খড় অথবা নাড়া বিছিয়ে দিতে হয়। শীতের সময় ছাগলকে ঠান্ডা থেকে রক্ষার জন্য এদের ঘরের দেয়ালে প্রয়োজনে চটের বস্তা টেনে দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ছাগলকে বছরে কয়বার নির্ধারিত মাত্রায় কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করতে হবে?

(ক) এক বার (খ) দুই বার
(গ) তিন বার (ঘ) চার বার

২। নতুন ছাগলকে আইসোলেশন শেডে কতদিন রাখতে হবে?

(ক) ৭ দিন (খ) ১০ দিন
(গ) ১৪ দিন (ঘ) ২০ দিন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জসিম সাহেব উন্নত জাতের ৫টি গাভী কিনে তা পালন করা শুরু করলেন। একদিন লক্ষ্য করলেন মাস খানেক পর এক দিন দেখলেন একটি গাভী কিছু খাচ্ছে না। ক্ষুরে ঘা এর মত কিছু লক্ষ্য করলেন এবং গবাদি প্রাণি চিকিৎসকের কাছে দেখালেন। তিনি বিভিন্ন পরামর্শ দিলেন।

ক) গবাদি প্রাণির ক্ষুরা রোগ কী?

খ) ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ব্যাখ্যা করুন।

গ) ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ব্যাখ্যা করুণ।

ঘ) বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ণে বিভিন্ন রোগবালাই প্রধাণ সমস্যা বিষয়টি বিশ্লেষণ করুণ।

২। সবুর মিয়া কযেক বছর ধরে গরুর খামার পরিচালনা করছেন প্রতিবছর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে খামার পরিচালনা করেন। কিন্তু পারিবারিক একটা সমস্যার কারণে তেমন যত্ন ও বাসস্থানের সংস্কার করতে না পারায় গরুর ঘর স্যাঁতস্যাতে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এবং একটি গরু খিচুনি দিয়ে মারা যায়।

ক) গবাদি প্রাণির ব্যাকটেরিয়া জণিত রোগ কি?

খ) গবাদিপ্রাণির অপুষ্টি জণিত রোগের নাম গুলি উল্লেখ করুণ।

গ) সবুর মিয়ার গরু যে রোগে আক্রান্ত হয়েছল তার লক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সবুর মিয়অর গরুগুলোর সমস্যা কিভাবে করা যেতে পারে। বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। গ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৫ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৬ ঃ ১। ক ২। গ